কাঁদো নদী কাঁদো :

নদীর কাঁদন নারীর রোদনে মিলে মিশে যায়

শুরুতেই দুটি কথা বলে নিই।

এক. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সৃষ্ট কাঁদো নদী কাঁদো নামক উপন্যাসের একজন নিমগ্ন পাঠক হিসেবে এই অভিনব কাহিনি - বিন্যাসের পাঠ - পরিক্রমায় বারংবার মনের মাঝে উচ্চারিত হয়েছে আমাদের দেশের বিরলদর্শন ভাবুক আবু সয়ীদ আইয়ুবের একটি উক্তি —'...শিল্পী সাহিত্যিকের মন হচ্ছে সমাজের সূক্ষ্মতম বীণাযন্ত্র। সামাজিক দুঃখের আওয়াজ সর্বাগ্রে ধ্বনিত হবে সেই বীণার তারে, এবং তারই ঝংকার সাড়া জাগাবে দেশজোড়া মানুষের চিত্তে। দুঃখ থেকে পরিত্রাণের পথও তাঁকে সকলের আগে দেখাতে হবে এবং সকলকে দেখাতে হবে...।' কাঁদো নদী কাঁদো -র স্রষ্টা - মন যথার্থই আইয়ুব -কথিত বীণাসম যে অনুরণন তুলেছে আমার পাঠক - চিত্তে তারই ভাষারূপ হল বর্তমান নিবন্ধ।

দুই. নদীকে এই উপন্যাসে, ব্যাপকতম দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃতির, আরেকটু কম ব্যাপ্তিতে মানবজীবন এবং আরও সীমায়িত পরিসরে বঙ্গনারী জীবনের রূপক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে বলা চলে। আমার চিন্তা - চেতনায় তৃতীয় রূপকটাই ঝংকার তুলেছে তীব্র মাত্রায় এবং পাশাপাশি কাহিনিকারের মানবচরিত্র বিশ্লেষণের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা ও তা প্রকাশের বাক্ - নিপুণতা আমাকে বিস্ময় - বিমূঢ় করে রেখেছে পা-পা করে এগিয়ে চলা পাঠককাল-এর প্রতিটি ক্ষণে। আরও বহু কথা মনের স্তরে স্তরে সাজানো হয়ে গেছে। সেসব কথা আপাতত সরিয়ে রেখে নারীজীবন এবং বিচিত্র মানব চরিত্র - চিত্রণের পারদর্শিতায় আলোচ্য উপন্যাসে আমার মনের যে স্পর্শকাতর কুঠুরিকে নাড়া দিয়েছে সেখানে মনোবিশেষ করা যাক্।

এক

কাহিনিকার শুনিয়েছেন কুমুরডাঙ্গা নামক ক্ষুদ্র একটি শহরের পাশ দিয়ে বয়ে চলা বাকাল নদীর কান্নার কথা। নদীটিতে চড়া পড়ে যায় এবং ক্রমে অগভীর হয়ে ওঠে বলে তাতে স্টিমার চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এরপর নদীটি জীবন হারাতে বসে এবং মৃত্যুপথযাত্রী সেই নদীর যন্ত্রণা কান্না হয়ে চমকে দেয় প্রথমে সেই শহরবাসী এক তরুণীকে এবং দ্রুত সময়কালের ব্যবধানে আরও অনেককে। 'দুর্বোধ্য ব্যাখ্যাতীত' সেই কান্না। নদীর কান্না। কেমন সেই নদী? কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের বড়ো আপনজন সেই নদী। তারা অকস্মাৎ জানতে পারে যে, 'তাদের বাকাল নদী স্টীমারের গমনাগমনের জন্যে অনুপযোগী হয়ে পড়েছে শুধু তাই নয়, মৃত্যুমুখেও পতিত হয়েছে। যে-নদীর অপর তীরে শরৎকালীন কাশবনের দিকে তাকিয়ে তারা উদাস হয়, যার বুকে পাল - দেয়া নৌকার চলাচল দেখে অন্তরে সুদূরের আহ্বান শোনে, কখনো তাতে সূর্যাস্তের শোভা দেখে নয়ন তৃপ্ত করে, সে নদী মরতে বসেছে।...নদীটি যেন মানুষের মত মরতে বসেছে।...মানুষের জীবনের মত নদীর জীবনও নশ্বর। সে-কথাই তাদের মন ভারি করে তোলে।' তারা একথাও ভাবে যে, তারা নদীকে কেবল নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে কিন্তু নদীকে ভালোবাসেনি কখনো। যদি বা একটু ভালোবাসা জেগেও থাকে 'সে-ভালোবাসা প্রথম সূর্যের ক্ষীণ উষ্ণতায় শিশিরবিন্দুর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মত শীঘ্র অদৃশ্য হয়ে যায়; যা সুন্দর কোমল তা জীবনের স্থূল বাস্তবতায় শীঘ্র বিলীন হয়ে যায়।'

আয়ু ফুরিয়ে কোলে ঢোলে পড়া সেই নদীর বিচিত্র কান্নার আওয়াজ প্রথমে শুনতে পায় কুমুরডাঙ্গার মোক্তার মোসলেহউদ্দিনের মেয়ে সকিনা খাতুন। সকিনা একটি মাইনর স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। শৈশব থেকেই সে মনের ভিতরে একটি গোপন মন তৈরি করে নিয়েছিল। কেমন তার জীবন? বঙ্গদেশের যেকোনো দরিদ্র ঘরের কন্যার জীবন যেমন হয়, তেমন। তার প্রতিটি দিন সূর্য ওঠার সঙ্গে শুরু হয়ে অনেক রাত পর্যন্ত ঘূর্ণাবর্তের মতো তাকে ঘিরে থাকে এবং 'যা ভেদ করে পশ্চাতে বা সম্মুখে তাকানো সম্ভব হলে তাকাবার সাধ আর হয় না'। সময়ই বা কোথায়! স্কুলে পড়ানো শয্যাশায়ী অসুস্থ মায়ের সেবা করা, ঘরদুয়ার পরিষ্কার করা, বাপের জন্য অজুর পানি প্রস্তুত রাখা, কোন ফাঁকে নামাজটুকু নিজের জন্য করে নেওয়া, পোষ্য গাভীটিকে দানাপানি দেওয়া, ভাইবোনদের পড়া দেখিয়ে দেওয়া, সকলের আহারের ব্যবস্থা করা, তারপর বাসনপত্র সব মেজে ঘষে নেওয়া — নিত্যদিনের কাজের ফিরিস্তি তার বড়োই লম্বা -চওড়া। গভীর রাতের সারাদিনের শেষে কত কথাই তার মনে জাগে! কিন্তু ক্লান্ত অবসন্ন দেহ তার ঘুমের অতলে তলিয়ে যায়। তলিয়ে যাওয়ার আগে 'অর্ধঘুমন্ত অবস্থায় কানে আঙুল দিয়ে সে - আঙুলটি বিষমভাবে কিছুক্ষণ নাড়ে; রাতের বেলা কানের খলি কখনো কখনো সুড়সুড় করে। হয়তো মনে যে-সব অবাস্তব কথা জাগে, তাদেরই তাড়ায়।'

এই মেয়ে একদিন নারীকণ্ঠের বিচিত্র কান্নাটি শোনে। শহরের অন্য কেউ শোনে। তার মনে প্রশ্ন জাগে, 'বিচিত্র দুর্বোধ্য কান্নাটি শোনার জন্য একমাত্র সে-ই কেন নির্বাচিত হয়েছে...?' এ প্রশ্ন আমারও। কাহিনিকারের কাছে। উত্তরও পেয়ে যাই পূর্বে অনাস্বাদিত ব্যতিক্রমী গল্পটির পাঠশেষে নিজের মনে। কান্নাটি যে তারই মনের অন্দরকক্ষের অভ্যন্তর থেকে উঠে আসা মর্মন্তুদ আর্তস্বর! মেয়েটি সংসারের খুঁটিনাটি কাজ সম্পন্ন করে নীরবে। অর্থ উপার্জন করে মাস্টারি করে। মা চিররুগ্ন। তার সহায়তা পায় না। নীরব কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মী যেন সে। তাকে সকলে চেয়ে চেয়ে দেখে। কিন্তু তার হৃদয়ের খোঁজ কেউ রাখে না। রাখার কথা ভাবেই না। সে কেবল নিত্যপ্রয়োজনের ব্যবহৃত মনুষ্যদেহধারী জীব মাত্র। প্রতিদিন বেলা নটায় বাড়ি থেকে সে রওনা দেয় স্কুলের পথে। মাথায় কালো ছাতাকে পর্দার মতো করে ধরে। তার পরণের সাদা শাড়িতে নতুনত্বের অভাব। ধূলাছন্ন অথবা কর্দমাক্ত স্যান্ডেল পায়ে, কেমন একটু মাজা-ভাঙা ধরনের ধীর মন্থর পায়ের চলন তার। চলার পথে কতজনের দৃষ্টি নিবন্ধ হয় তার দিকে। বাড়ির পথ পেরিয়ে নদীর ধারে পথটি পেরিয়ে সে যখন হাঁটে তখন তাকে প্রথমে দেখতে পায় ডাক্তার বোরহানউদ্দিনের বৃদ্ধা পিতা। তিনি ভোরে নামাজ শেষে একটু নিদ্রা সেরে নিয়ে জানলা -পথে বাইরে দৃষ্টি মেলে ধরেন যখন তখনই মেয়েটিকে দেখে তিনি তাঁর ওষুধ খাওয়ার সময় হয়েছে বুঝতে পারেন। সকিনা যেন তাঁকে ওষুধ খাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে একটি উচিতকর্ম সাধন করে।

দ্বিতীয় যে জনের দৃষ্টিপথে পড়ে সকিনা সে মানুষটি হল উকিল আফতাব খানের বাড়িতে আশ্রিত মৌলভি। তার নাম খয়রাত। সে সেসময় বাড়ির দুটি ছোটে মেয়েকে কোরানপাঠ শেখাতে শেখাতে সকিনাকে দেখে। সে মেয়েটির বেপর্দা চলা মেনে নিতে পারে না। তার মনের মাঝে রয়েছে যুবতী নারীর বেপর্দা চলাফেরার বিরুদ্ধে নিষেধের কঠিন পাঁচিল। কিন্তু সকিনাকে 'এত নিরীহ এত অলোভনীয়' মনে হয় সে নিষেধাজ্ঞার পাঁচিল সশব্দে ভেঙে পড়ে। সে তাই অবাক চোখে তাকে দেখে কেবল।

এরপর তার চলার পথে পড়ে কাছারির নাজির রহমত মিঞার কাঁচা বাড়ি। সে বাড়ির থেকে দেখে সেসময় নাজিরের পুত্রবধূ বানু যার শিক্ষার্থী স্বামী অন্যত্র থাকে বসে সে স্বামীসঙ্গলাভে বঞ্চিত। সকিনার স্বাধীন চলা-ফেরার জন্য তার প্রতি সে 'ঈর্ষাজনিত কৌতূহল বোধ করে'।

সকিনার ছেলেদের হাইস্কুলের সামনের রাস্তায় পৌঁছলে সেই স্কুলের তরুণ শিক্ষক সুলতানের সে আগ্রহের বিষয় হয়ে ওঠে। সকিনা রূপবতী নয়। অতএব দেহলাবণ্য সে-আগ্রহের হেতু নয়। আকর্ষণ নয়, সকিনা তার গবেষণার বিষয়। তাকে ঘিরে তার মনে প্রশ্ন জাগে 'যে-মেয়ে নিত্য একাকী পথে বের হয় সে-মেয়ে কখনো অক্ষতদেহ কুমারী কি না।' এই গবেষণা তাকে নেশার মতো অধিকার করে থাকে।

সকিনার এরপর সারি বাঁধা কয়েকটি হোটেলের রাস্তা ধরতে হয়। এই পথটা তাকে সন্তর্পণে পেরোতে হয়। হোটেলবয় মানুষজনের কারো কারো চোখ তার প্রতি চেয়ে কঠোর নিথর নিশ্চল হয়ে যায়। ফলে তার চলায় সন্ত্রস্তভাব ফুটে ওঠে। পিঠে শিরশিরানি বোধ হয়।

তাকে তারপর মুদিখানার সামনে দিয়ে চলতে হয়। দোকানের মালিক ফানু মিঞা তার দিকে শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার মাজা-ভাঙা ধরনের হাঁটার কারণ জানতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সে সকিনার জন্মদাতার আর্থিক অসচ্ছলতার কথা জানে কেননা সে 'সকলের বাড়ির হাঁড়ির খবর রাখে'। সে ভাবে, শারীরিক দুর্বলতার জন্যেই সে মাজা-ভাঙা ধরনে হাঁটে এবং অনাহার আর অবিশ্রাম তার দৈহিক দুর্দশার প্রধান কারণ।

এরপর ওষুধের দোকানের সামনে দিয়ে যেতে হয় তাকে। সেখান থেকে সকিনাকে দেখে রুকুনুদ্দিন শেখ যে 'মানুষের নাড়ির খবর রাখে'। সে জানে,, মেয়েটির মা কঠিন ব্যাধিতে শয্যাশায়ী তাই ভাবে, একদিন সকিনারও 'স্বল্পপুঁজি স্বাস্থ্য নিঃশেষ হয়ে যাবে' এবং মায়ের মতোই তাকেও নানাবিধ ব্যাধির দৌরাত্ম্য সহ্য করতে হবে।

একটিমাত্র যে মানুষটি সকিনাকে স্নেহ-মমতাভরা চোকে তাকিয়ে দেখে সে হল কাপড়ের দোকানের মালিক মোহনচাঁদ। মাস্টারনি বলে তাকে সে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে এবং তার প্রতি দরদভাব বোধ করে। সে তাকে একখানি শাড়ি উপহার দেওয়ার সদিচ্ছা নিয়ে প্রতীক্ষাই করে চলে কিন্তু ইচ্ছেটি তার পূর্ণ হয় না। তবে মেয়েটির প্রতি তার মনে মায়া জমা হয়ে থাকে।

সাইকেলের দোকানের সামনে গেলে দোকানদার ছলিম মিঞা ভ্রূকুটি মেলে তাকে দেখে। দেখার পরই চোখ সরিয়ে নেয় যেন মেয়েটির দিকে তাকানোর অভ্যেসটি তার নিজেরই পছন্দের নয়।

মাঝে আরও কতরকমের পথ তাকে পেরোতে হয়! গাছগাছালি ভরা এলাকা, সরকারি শবাগার, হাসপাতাল, দরিদ্র পাড়া, নিম্ন মধ্যবিত্ত পাড়া পেরিয়ে তবে সে পৌঁছোয় তার স্কুলে— মেয়েদের মাইনর স্কুল।

এই মেয়ে, দরিদ্র পরিবারের সর্বদিক থেকে বঞ্চিতা তরুণী একটি ব্যাখ্যাতীত কান্না শুনতে পায় এবং অন্যদের জিজ্ঞাসার উত্তরে সে বলে, সে কান্না নদীর বুক থেকে উঠে আসা কান্না।

এই নদীর কান্নার আড়ালে রয়েছে বঙ্গনারী জীবনের সামাজিক বঞ্চনার উপাখ্যান। বঙ্গ নারী তার সমাজে কতরকম স্ত্রী-পুরুষের কতরকম কৌতূহল, সংশয় ও প্রশ্নাদির বিষয়। কতরকমে ব্যবহৃত হয়ে কেবল বঞ্চনাই কুড়িয়ে চলে তার জীবন। ভালোবাসার অভাবে মৃতপ্রায় জীবন বয়ে নিয়ে চলাই তার নিয়তি। সে সকলের ভার বহন করে ভরকেন্দ্র হয়ে ওঠে। অথচ তার ভার ভালোবেসে বহন করার দায় কেউ গ্রহণ করে না। সে শুধু দিতে জানে নিজেকে নিঃশেষে। প্রতিদানে পায় না কিছুই। হৃদয়ের গোপন কুঠুরিতে তার কান্না জমা হতে হতে একদিন তার প্রকাশ ঘটে কিন্তু তখন সে মৃত্যুপথযাত্রী। জীবনে ফেরার মুহূর্ত বাকি থাকে না তখন আর। তাই সকিনা শুনেছে যে কান্না এবং যাকে সে বলেছে নদীর কান্না সে রোদন প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি বঙ্গনারীর অব্যক্ত যন্ত্রণার ব্যক্ত-রূপ। সে কান্না ক্রমে ক্রমে সকলের কর্ণগোচর হয় এবং তারা সাধ্যমতো নানা দ্রব্যাদি নদীর বুকে নিবেদন করে তাদের বহুকাল ধরে কৃত অন্যায়ের, অবহেলার প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছে। কিন্তু তাতে কোনো সুফল হয়নি। নদীর মৃত্যুকে ঠেকানো যায়নি শেষ পর্যন্ত। এ যেন নদীর প্রতি সমাজের সর্বপ্রকার অবহেলার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে পূর্ব থেকে সকলকে সজাগ করে দেওয়া, অনিবার্য করুণ পরিণতির মর্মান্তিক চিত্রকে বাস্তব করে তোলে।

সকিনা খাতুন সকল বঙ্গনারীর প্রতিনিধি। গল্পকার বলে, 'হয়তো নদী সর্বদা কাঁদে, বিভিন্ন কণ্ঠে, বিভিন্ন সুরে, কাঁদে সকলের জন্যই। মনে মনে বলি : কাঁদো নদী কাঁদো।' আমি যেন শেষ বাক্যটি শুনি, কাঁদো নারী, কাঁদো। এই নারী আবার প্রকৃতি -কন্যা এবং মানব-জীবনের অন্যতম প্রতিনিধি। তাকে চেয়ে চেয়ে দেখার মানুষের অভাব নেই। বিচিত্র সেসব চাহনি। কেবল তার হৃদয়ের কান্না শোনার মানুষের বড়ো অভাব। তাই ১৫৯ পৃষ্ঠা (ভারতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫)-র কলেবরের আলোচ্য উপন্যাসটির অভ্যন্তরে সযত্নে কথিত হয়েছে সাকিনার বিড়ম্বিত জীবনের আখ্যান যার চমকপ্রদ বিবরণ আমায় ভাবিয়েছে সমধিক।

নদীর কান্নাকে নারীর মানবজীবনের কান্না মনে হওয়ার হেতু কি? উপন্যাস - স্রষ্টার কথায়, কান্নাটা মেয়েলোকের। 'অজানা মেয়েলোকটি কখনো কাঁদে করুণ গলায়, কখনো বিলাপের ভঙ্গীতে, কখনো গুমরে গুমরে কখনো মরণকান্নার ঢঙে।...কখনো কাঁদে উচ্চ তীক্ষ্ণকণ্ঠে, কখনো অস্ফুটভাবে নিম্নকণ্ঠে।' সে কান্না কখনো 'বাঁশঝাড়ের হাওয়ার মর্মরের মত শোনায়, কখনো বা বাঁশির রব ধরে, কখনো আবার রাতের অন্ধকারে পাখি - শাবকের কাতর আর্তনাদের মত শুরু হয়ে অবশেষে বিলম্বিত রোদনে পরিণত নয়।'

এই কান্না নিঃসন্দেহে চিরকালের অবহেলিত, বঞ্চিতা বঙ্গনারী-জীবনের মর্মস্থলে সঞ্চিত হওয়া কান্নার ব্যক্ত ধ্বনি আর সে ধ্বনিকে অনন্যসাধারণ কথন-ভঙ্গিতে নদীর রূপকে গল্পের মোড়কে পাঠককে শুনিয়েছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। সচরাচর চোখে পড়ে না এমন আঙ্গিকে বিন্যস্ত এই উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের এক দুর্মূল্য সম্পদ।

দুই

এবারকাহিনিকারের কলমে চিত্রিত কিছু মানব চরিত্রের বর্ণনা শোনা যাক। প্রধান দুটি চরিত্রের কথা আগে বলে নিই। একজন হল তবারক ভুইঞা। বছর চল্লিশ বয়েস তার। কিন্তু তার স্বভাবের কথা জেনে বিস্ময় জাগে মনে। স্বভাবটি তার কৌতূহলী। সে কৌতূহল অভিনব। শিশুবয়েস থেকে ই দুষ্টুমি বা দৌরাত্ম্য ভুলে 'ঘন্টার পর ঘন্টা মানুষের জীবনযাত্রা তাকিয়ে তাকিয়ে' দেখা ছিল তার বিচিত্র নেশা। নেহাতই গতানুগতিক সব দৃশ্য 'তার কচিমনে মায়াজাল সৃষ্টি করতো, নিত্য একটি দৃশ্য দেখে তার সাধ মিটতো না, মোহ ভাঙতো না।' বুঝবার ক্ষমতা লাভ করার পর সে বুঝতে পারে, প্রতিটি নর-নারী 'প্রতিদিন একই কাজ করেও সামগ্রিক জীবনের সুখ-দুঃখ আশা -আকাঙক্ষা নিয়ে একটি সুদীর্ঘ জীবন কাহিনী রচনা করে, পদে পদে, তিলে তিলে।' সেদিন থেকে সে যেন পলকহারা হয়ে দেখেই চলেছে মনুষ্যজীবনকে। তার শোনানো কাহিনি দিয়ে তাই কাহিনি রচয়িতা পাঠককে মগ্ন রাখতে সফল হয়েছেন।

আরেকজন হল তবারাক-কথিত কাহিনির একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র মুহাম্মদ মুস্তফা। সে কোনোদিন কারও পক্ষে বা বিপক্ষে মত প্রকাশ করে না। তার জীবন গভীর নীরবতাপূর্ণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার নিজস্ব কোনো মত থাকে না। সে ভাবে, 'দাঁড়-হাল-পাল এবং সম্মুখে একটি ধ্রুবতারা থাকলেই গহিন রাতে অকূল সমুদ্রে পার হয়ে যাওয়া যায়; বোঝার ভার ডুবে মরার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে কেবল তার চিন্তাধারা এমনই যে তার যদি ধারণা হয় বিভিন্ন ফুলের নাম-বিবরণ জানা নিতান্ত নিষ্প্রোজনীয় তবে ফুলের দিক একবার ফিরেও তাকাবে না, কেউ গোলাপকে সূর্যমুখী বলে ভুল করে বিস্মিত হবে না, প্রতিবাদও করবে না।' তার এই জীবন-দর্শন তাকে ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েও সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করে দরিদ্র অসহায় বালক থেকে হাকিমের পদে উন্নীত হতে সাহায্য করেছে। তবু শেষরক্ষা হয়নি তার এই স্বভাবের জন্যেই। অন্যের মতবাদ দ্বারা প্ররোচিত হয়ে সে নিজেকে চাচাতো বোন খোদেজার অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য দায়ী মনে করে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। সে কাহিনি যেন প্রখর বাস্তব সত্যের রূপ ধরে পাঠককে মুস্তফার মতো আদ্যন্ত সাদামাটা মানুষের বিয়োগজনিত শোক-ব্যথায় কাতর করে তোলে।

স্টিমার ঘাট-এর স্টেশন মাস্টার খতিব মিঞা জানতে পারে যেদিন, স্টিমার আর আসবে না সেদিন স্তব্ধ হয়ে বসে ভাবছিল, 'নিত্য একবার উজানে একবার ভাটিতে দু-দুবার ঘাটে জীবন-স্পন্দন জাগিয়ে অব্যর্থভাবে যে-স্টীমার এসেছে সে-স্টীমার আসবে না। সুগভীর সুরে বাঁশি বাজিয়ে দূরত্বের বিচিত্র আবহাওয়া সৃষ্টি করে স্টীমারের আগমন, ঢেউ-এর উচ্ছৃঙ্খল নৃত্য, যাত্রীদের এস্তব্যস্ত ওঠা-নাবা, লস্করদের কর্মতৎপরতা, অবশেষে স্টীমারের প্রস্থানের পর আকস্মিক নীরবতা, আরো পরে উল্টো পথের স্টীমারের জন্যে প্রতীক্ষা'—এসব দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার কথা। মানুষ তার চোখে যাত্রীরূপেই দেখা দিয়েছে এতকাল। তার কাছে 'যাত্রীরা ছায়া, উড়ন্ত পাখির ছায়া, যে-ছায়া দিনে দুবার দেখা দেয় তার কর্মজীবনের প্রাঙ্গণে; কে কী রকমের লোক তা বোঝার ক্ষমতা সে সত্যিই হারিয়েছে।' তাই স্টিমার আর আসবে না শুনে সে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। 'মুখে দুশ্চিন্তার রেখা।' কিছু পরে নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয় সে। সে জানে এবং মানে 'অধিকাংশ যাত্রী নিরক্ষর হলেও লিখিত নোটিশ জারি করা একটি অলঙ্ঘনীয় আইন।'

উকিল কফিলউদ্দিন -এর চরিত্র তার ধ্যানধারণায় উৎকটরূপে প্রকাশিত হয়েছে। সে ভাবে, 'যে - উকিল এ-স্থানে সে-স্থানে ছুটাছুটি করে, মক্কেলের চোখে তার দাম বেশি।' এবং 'স্নেহকাতর উকিলের ওপর মক্কেলদের বিশ্বাস কম হয় : উকিলের মধ্যে হৃদয়হীন চরিত্রের সন্ধান করে তারা।' এমন ভাবনা দ্বারা পরিচালিত, জাগতিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষটি অশুভশক্তির নজর থেকে বাঁচতে কুমুরডাঙ্গা ছেড়ে যাওয়ার সময়ে অকস্মাৎ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সদাসতর্ক মানুষটির এমন অতর্কিতে অসহায়ভাবে চলে যাওয়াকে পাঠকরা কীভাবে নেবেন জানি না। তবে কাহিনিকারের শ্লেষ ধরা পড়তে কোনো আড়াল থাকে না। জীবনকে সুপরিকল্পিত ছাঁচে গড়তে যাওয়ার দুর্নিবার আকঙ্ক্ষা মানুষের জীবনে কতভাবেই না প্রত্যাখ্যাত হয়! সে সত্যই ধরা পড়ে আইন-যুক্তি-বিষয়বুদ্ধি নির্ভর অতি-বুদ্ধিমান কফিলউদ্দিন -এর জীবনকাহিনিতে!

পিতৃহীনা, আত্মীয়-পরিবারের আশ্রিতা খোদেজার গায়ের 'রঙ গাঢ় শ্যামল, মাথাভরা চুল'। সে কথা বলত না। অন্তত তার কথা শোনা যেত না। 'শুধু সে-সময়ে তার কণ্ঠের আওয়াজ শোনা যেত যখন সে উঠানের প্রান্তে দাঁড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া হাঁস - মোরগ -মুরগীদের ডাকতো, তার মিহি গলায় স্নেহমিশ্রিত অন্তরঙ্গতার ভাব; হাঁস-মোরগ-মুরগীর সঙ্গে সে একটি গভীর মিতালী বোধ করতো।' তার চোখ দুটিতে সবসময় বিষাদ-ছায়া দেখা যেত। সে বিষাদ তার চোখে স্থায়ী আস্তানা গড়ে নিয়েছিল। দুঃখের যে কোনো প্রতিকার নেই এমন প্রত্যয় তার মনে চিরস্থায়ী হয়ে গিয়েছিল। অনাথা এই মেয়েটির মায়ের প্রতি সাময়িক করুণাবশত মুস্তফার বাবা অঙ্গীকার করে ফেলে তাদের শৈশবে যে, সে তার ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দেবে। তারপর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যায়। মুস্তফার নিজস্ব স্বাভাবপ্রকৃতিবশত সে প্রতিশ্রুতিকে আমল দেওয়ার মতো কোনো কারণ খুঁজে পায়নি। তার বিয়ে অন্যত্র ঠিক হয়ে যায়। এসময়ে খোদেজার অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে। অনাথিনী মেয়েটির জীবনে সত্যিই দুঃখের কোনো নিরাময় ঘটেনি। পরজীবী বাঙালি মেয়ের জীবনের এমন নিষ্করুণ পাঠে আবারও নারীজীবনের কান্নার কথাই উপন্যাসটিতে মুখ্য উপজীব্য বলে মনে হয়।

এই মেয়েটিরর প্রতি যার মনে স্নেহমমতা ছিল সে হল গল্পের কথক 'আমি' মুস্তফার চাচাতো ভাই। তার ভূমিকা গোটা উপন্যাসে রহস্যাবৃতই থেকে গেছে। সে হৃদয়বান হওয়া সত্ত্বেও, পরিবেশ পরিস্থিতি সঠিক বুঝেও দুটি নিরীহ জীবনের সমাপ্তিকে রোধ করতে পারেনি। আলোচ্য কাহিনিতে সেটি একটি মর্মান্তিক সত্য।

খেদমতুল্লা মুহাম্মদ মুস্তফার বাবা। ছেলের সঙ্গে তার অদ্ভুত সম্পর্ক। ছেলেকে নিয়ে সে স্বপ্ন দেখে কিন্তু সেসব কথা ভেবে সে ধৈর্যহারা হয়ে পড়ে। ছেলের প্রতি নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। সে ভাবত, 'প্রহার দ্বারাই স্মৃতিশক্তির অভাব মেটানো যায়, দৈনিক মানসিক শ্রান্তি দূর করা যায় অতিশ্রমের সাহায্যে। বস্তুত তার ভাবটি ছিল অনেকটা নির্বোধ গাড়োয়ানের মত, যে গাড়োয়ান শ্রান্ত ক্লান্ত মৃতপ্রায় জানোয়ারকে কেবল অঙ্কুশাঘাতেই গন্তব্যস্থলের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে।' এমন সব ভাবনাই তার জীবনে এনে দিল ভয়াবহ পরিস্থিতি। সে খুন হল। সে শঠতাকে জীবনে সম্বল করে জাগতিক লাভের কারবারি হতে চেয়েছিল। পরিবর্তে দিতে হল তার আপন প্রাণ। জীবন যে কতভাবে শিক্ষা দেয় মানুষকে! তা দেখে জীবিতদের বলতে শোনা যায়, 'বদলোকের নসিবে অপঘাতে মৃত্যুই বরাদ্দ থাকে।'

কালু মিঞা প্রকৃতির মানুষ। জীবনভর বহু নৃশংস কাণ্ড ঘটিয়ে জীবনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে একদিন মসজিদে আসে জামাই -এর ঘাড়ে চেপে। জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল, সেই খেদমতুল্লাকে খুন করিয়েছিল। মসজিদে এসে সেদিন সে ঘোষণা করল জামাই -এর মারফত

যে, সে মুস্তফার বাবাকে খুন করেনি। সবাই ভাবল, এমন অনৃতভাষণে মসজিদে ভয়ানক কোনো কাণ্ড ঘটে যাবে। অবশ্যই অলৌকিক কিছু। কিন্তু কিছুই ঘটল না। কালু মিঞা মসজিদ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। কালু মিঞা এরপর সাহসী হয়ে উঠল অতি বৃদ্ধ বয়সেও। মুস্তফাকে শাস্তি দেওয়ার বন্দি আঁটল কেননা, তার অপরাধ এক একদিন অন্যমনে চলতে চলতে কালু মিঞার বাড়ি, তার বাবার হন্তারকের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে তার লোকজনদের মজরে পড়ে যায়। তার কোনো দুরভিসন্ধি থাকতে পারে, আপন দুর্বুদ্ধিবশত সে কথা ভেবে নিয়ে সে প্রথমে মসজিদের ঘটনাটি ঘটাল এবং তারপর একটি বালককে মুস্তফাদের বাড়ি পাঠিয়ে মুস্তফার অবৈধ সন্তান বলে দাবি জানিয়ে বসল বালকটির মায়ের সাক্ষ্য উপস্থাপন করে। মুস্তফা বাবার খুনের প্রতিশোধ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ভেবে নিয়ে এমন সব অপকর্মের সূচি সে তৈরি করেছিল। কিন্তু তা ব্যর্থ হল। ধূর্ত কালু মিঞা ধরা পড়ে গেল মানুষের চোখে। বললে, 'যে -মানুষ খোদার বান্দাকে খুন করতে ভয় পায় না সে-মানুষ খোদার ঘরে মিথ্যা বলতে ভয় পাবে কেন?' বস্তুত এমন নরাধমরা কোনো পাপকর্মেই পিছপা হয় না। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে পৌঁছে অসমর্থ অবস্থাতেও নয়! মনুষজীবনের কত না বিচিত্র রূপ ও জটিলতা!

তরুণ আইনজীবী আরবাব খানের স্ত্রী আয়েষার মধ্যে 'দেমাগ' সুপরিস্ফুট। একটি ক্ষুদ্র নারীবাহিনী সকিনা খাতুনকে জেরা করার সংকল্প নিয়ে তাদের বাড়িতে চড়াও হয়। সত্যি সে কোনো কান্না শোনে কি না — তারা জানতে আসে না, জানার ছুতোয় ধমক দিতে আসে আজগুবি কথা রটানোর জন্য। সে প্রমীলা দলের নেত্রী আয়েষা। তার পিতৃপরিবার এককালে ধনী ছিল। স্বামীর 'পেশাজনিত সার্থকতার জোরে' তার অঙ্গে অলঙ্কারের ছড়াছড়ি, নতুন শাড়ি, নাকী স্বর, বাঁকা ভ্রূ, ঠোঁটের পাশে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের আভাস, কটকটে চোখ—সবী মিলিয়ে তার ব্যক্তিত্বের ঝিলিককে আনুগত্য না জানিয়ে উপায় থাকে না। সে সকিনাকে প্রশ্ন করে 'সত্যি কিছু শুনতে পান নাকি?' সকিনাকে ঘায়েল করার প্রত্যয় ফুটে ওঠে সে প্রশ্নের তীক্ষ্ণতায়। সকিনা ঘাবড়ালেও সত্য জবাব দেয়। সে বলে, সে কান্না শোনে এবং সে কানা বাকাল নদীর কান্না। আয়েষা পরাস্ত হয়। তার বিদ্রুপ, কটাক্ষ, তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর কোনো কিছুতেই সরলমনা মেয়েটির আচরণ ও বাক্যে পরিবর্তন দেখা যায় না। আয়েশা তাকে এমনও বলে, তার ভয় করে না কান্না শুনে। তাহলে কি তার মন খুশিতে আত্মহারা হয়? এমন শ্লেষোক্তিতেও সকিনা অবিচল থাকে তার সত্য জবাবে। সমাজের প্রখর দৃষ্টির সামনে 'মাজাভেঙে' চলার ধরনে জীবনের পথ-চলা মেয়েটির নিজস্বতার কাছে ধরা পড়ে যায় পরধনে গর্বিতা শশীর অন্তরের নিঃস্বতা।

শেষ করা যাক্ তবারক ভুইঞার স্ত্রীর কথা বলে। মুস্তফা আত্মহননের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে এই তরুণীর সংসারজীবনে চলাফেরার প্রতি একটু হলেও মনোযোগী হয়েছিল। তরুণীটির মুখ দেখে তার মনে হয় যেন, 'মুখটা মন - খোলা মুখ'। সংসারের সর্বত্র নিরন্তর তার আসা যাওয়া। চোখের আড়াল হলেও মনে 'সে যেন অদৃশ্য হয়ে যায়নি, উঠানো বাড়ির বারান্দায়, কুয়োর পাশে নিমগাছের তলে - সর্বত্র তার স্পর্শ।' হয়তো একটি সুস্থ, সুন্দর সুখী জীবনের স্বপ্ন মনের গোপন মহলে সযত্নে লুকিয়ে তাঁর জীবন। তার জন্য পাঠক মাত্রেই কষ্ট বোধ হবে উপন্যাস পাঠ শেষে।

তারপর বিহ্বলতা কাটলে মনে জাগে একটি সত্য, মানবজীবন দুঃখময়। যতই দুঃখকে এড়াতে যাওয়া যায় জীবনে ততই সে বাঁধে নানা বন্ধনে। তাই তো কাঁদে, জীবন কাঁদে।

মীরাতুন নাহার